সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা :

অজরচন্দ্র সরকার (১৯৪৯) বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অপূর্বকুমার রায় (১৯৭৬) উনিশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্য : ইংরাজি প্রভাব, জিজ্ঞাসা।

(১৯৮৯) শৈলীবিজ্ঞান, মডার্ন বুক এজেন্সী।

আশিসকুমার দে (১৯৮৩) উপন্যাসের শৈলী : তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যাপিরাস।

(১৯৮৭) আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, শিলালিপি।

উদয়নারায়ণ সিংহ (১৯৮৭) সম্পাদিত কবিতার ভাষা, গাঙ্গেয়পত্র বিশেষ সংকলন।

ক্ষেত্র গুপ্ত (১৯৮৬) বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (১ম খণ্ড), গ্রন্থনিলয়।

নবেন্দু সেন (১৯৭১) গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা।

(১৯৮৮) বাংলা গদ্য স্টাইলিসটিকস্, সাহিত্যপ্রকাশ।

পবিত্র সরকার (১৯৮৫) গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৮৯) সাহিত্যবিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং।

মনোমোহন ঘোষ (১৯৪২) বাংলা গদ্যের চার যুগ, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং।

শিশিরকুমার দাশ (১৯৮৬) গদ্য পদ্যের দ্বন্দ্ব, দে'জ পাবলিশিং।

(১৯৮৭) কবিতার মিল ও অমিল, দে'জ পাবলিশিং।

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৬০) বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, মিত্রালয়।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৫) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী।

সজনীকান্ত দাস (১৯৬২) বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, মিত্রালয়।

সুকুমার সেন (১৯৬৭) বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত (১৯৭৯) কাব্যালোক ৫ম সংস্করণ, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং।

হীরেন চট্টোপাধ্যায় (১৯৮২) বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

ইংরেজি :

আব্রামস, এম. এইচ. (১৯৭৮) এ গ্লসারি অব লিটারারি টার্মস, ম্যাকমিলান।

বারবাশ, য়ুরি (১৯৭৩) ইসথেটিকস অ্যান্ড পোয়েটিকস, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো।

চ্যাটম্যান, সেম্যুর (সম্পা.) (১৯৭১) লিটারারি স্টাইল, আ সিম্পোসিয়াম, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন।

চ্যাটম্যান, রেমন্ড (১৯৭৩) লিংগুইস্টিকস্ অ্যান্ড লিটারেচর, এডওয়ার্ড আর্নল্ট পাবলিশার্স, লন্ডন।

ক্রীস্টাল, ডেভিড অ্যান্ড

ডেভি, ডেরেক	(১৯৬৯)	ইনভেস্টিগেটিং ইংলিশ স্টাইল, ইন্ডিয়ানা য়ুনিভার্সিটি প্রেস, ব্লুমিংটন।
এংকভিস্ট, নিলস এরিক এট অল	(১৯৬৪)	লিংগুইস্টিকস অ্যান্ড লিটারারি স্টাইল, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন।
	(১৯৭৩)	লিংগুইস্টিকস্ স্টাইলিস্টিকস্, মুটন, দ্যা হেগ।
ফ্রিম্যান, ডোনাল্ড সি. (সম্পা.)	(১৯৭০)	লিংগুইস্টিকস্ অ্যান্ড লিটারারি স্টাইল, হোস্ট রাইনহার্ট অ্যান্ড ইউন্সটন, নিউ ইয়র্ক।
প্রায়েড, ডি. (সম্পা.)	(১৯৭২)	দা প্রাগ স্কুল অব লিংগুইস্টিকস্ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ টিচিং, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন।
গ্রৈ, বেনিসন	(১৯৬১)	স্টাইল : দা প্রব্লেম অ্যান্ড ইটস ফল্যুশনস্, মুটন, দা হেগ।
গারভিন, পল এল (সম্পাদিত ও অনূদিত)	(১৯৬৫)	এ প্রাগ স্কুল রিডার অব্ ঈসথেটিকস্ লিটারারি স্ট্রাকচার অ্যান্ড স্টাইল, জর্জ টাউন।
লাবক, পার্সি	(১৯৫৪)	দা ক্রাফট অব্ ফিকশান, জোনাথান কেপ, লন্ডন।
মুখার্জী, রমারঞ্জন		হিস্ট্রি অব স্যাংস্ক্রিট লিটারারি ক্রিটিসিজম, কলকাতা।
মুইর, এডুইন	(১৯২৮)	দা স্ট্রাকচার অব্ নভেল।
মারী, মিডলটন	(১৯৬১)	দা প্রব্লেম অব্ স্টাইল, রিপ্রিন্ড এডিশন, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটিচ প্রেস, লন্ডন।
মিলিচ, লুই, টি	(১৯৬৯)	স্টাইলিস্টস্ অন্ স্টাইল : আ হ্যান্ডবুক উইথ সিলেকশন ফর অ্যানালিসিস।
পেটার, ওয়াল্টার	(১৯৬৭)	অ্যাপ্রিসিয়েশনস ইউথ অ্যান এসে অন স্টাইল, রূপা এডিশন, কলকাতা।
সেবক, টমাস এ, (সম্পাদিত)	(১৯৬০)	স্টাইল ইন ল্যাংগুয়েজ, দা এম. আই. টি. প্রেস, ম্যাসাচুসেটস্, কেম্ব্রিজ।
স্পিৎজার, লিও	(১৯৭৬)	লিংগুইস্টিকস্ অ্যান্ড লিটারারি হিস্ট্রি, প্রিন্সটন, য়ুনিভার্সিটি প্রেস, প্রিন্সটন, নিউজার্সি।
টার্নার, ডব্লিউজে	(১৯৭৩)	স্টাইলিস্টিকস্, পেঙ্গুইন বুকস, মিডলসেকস্, ইংল্যান্ড।
উলমান, স্টিফেন	(১৯৬৪)	ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড স্টাইল, বেসিল ব্ল্যাকওয়েল, অক্সফোর্ড।
জিস, আভনের	(১৯৭৭)	ফাউন্ডেশন অব্ মার্কসিস্ট ঈসথেটিকস্, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো।

বাংলা (পঞ্চম পত্র)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায় ঃ ৩

একক ঃ ১ - ৪

প্রবন্ধ সাহিত্য পরিচিতি

'প্রবন্ধ' শব্দটি সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া গেলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ বলতে আমরা যা বুঝি তা আসলে ইংরেজি Essay শব্দের প্রতিশব্দ। 'A Dictionary of Literary Terms'-এ J. A. Cuddon, Essay সংজ্ঞা দিয়েছেন "A Composition, usually in prose, which may be of only a few hundred words or of book length and which discusses, formally or informally, a topic or a variety of topics. It is one of the most flexible and adaptable of all literary forms".

ইংরেজিতে Essay শব্দটি এসেছে ফরাসি 'Essai' শব্দ থেকে। 1580 খ্রিস্টাব্দে ফরাসি লেখক মনতেইন (Michel de Montaigne) তাঁর একটি আত্মভাবপ্রধান রচনাকে 'Essaies' নামে প্রকাশ করেন। ইংরেজিতে ফ্রান্সিস বেকন প্রথম Essay শব্দটি ব্যবহার করেন। যদিও মন্তেইন ও বেকনের বহু পূর্বেই প্রাচীনকালে গ্রিস ও রোমে প্রবন্ধধর্মী গদ্য রচনার চর্চা করেছিলেন থিওফ্রেটাস, প্লুতার্ক, সিসেরো প্রমুখ।

সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' শব্দটির নানা অর্থে বহুল ব্যবহার দেখা যায়, ছন্দগত বন্ধন, বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু সম্বন্ধরূপ বন্ধন, সর্গ-পর্ব-অধ্যায়ের বন্ধন, রচনাক্রমের ধারাবাহিক পারম্পর্য-রূপ বন্ধন ইত্যাদি নানারকম বন্ধন সমন্বিত গদ্য পদ্য উভয় রচনাতেই 'প্রবন্ধ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'প্রবন্ধ' শব্দটি সাহিত্য দর্পণকার আচার্য বিশ্বনাথ ব্যবহার করেছিলেন কাব্যাদির বিভিন্ন উপাদানগত সংগতি বোঝাতে। যেমন, নাটকের ভাষা, পঞ্চসন্ধি সমন্বিত ইত্যাদি সমস্ত আঙ্গিক নিয়ে যে সংগতি তাকে বলা হত নাট্য প্রবন্ধ।

'প্রবন্ধ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি 'প্র + √ বন্ধ্ + অ' থেকে। অর্থ হল প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত বা প্রকৃষ্টভাবে গ্রথিত রচনা। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে যে-কোনো রকম প্রকৃষ্ট বন্ধন বোঝাতেই প্রবন্ধ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন 'লাচারী প্রবন্ধ', 'পয়ার প্রবন্ধ', 'পাঁচালী প্রবন্ধ' প্রভৃতি। যেমন কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর অনূদিত রামায়ণে ব্যবহার করেছেন 'যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে'। এছাড়াও চৈতন্যমঙ্গাল, মনসামঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল, শিবায়ন ইত্যাদি গ্রন্থে প্রবন্ধ শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। তবে সেখানেও এই শব্দটির দ্বারা কোনো সাহিত্যিক সংরূপ বোঝাবার চেষ্টা হয়নি। আধুনিক যুগে ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই এটি একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যিক সংরূপের স্বীকৃতি পেয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভাবসমৃদ্ধ মননশীল গদ্যরচনাকেই প্রবন্ধ বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে গদ্যমাধ্যমের ব্যবহার শুরুর পরে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের হাতে যখন এই ধরনের রচনার সূত্রপাত ঘটে তখন তারা সাধারণত 'প্রস্তাব' শব্দটি ব্যবহার করতেন। এছাড়া প্রবন্ধ বোঝাতে বাংলায় 'সন্দর্ভ', 'নিবন্ধ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' গ্রন্থে সন্দর্ভ শব্দের সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'শব্দের সহিত শব্দের, অর্থের সহিত অর্থের, এবং শব্দের সহিত অর্থের সম্যক্ প্রকার গ্রথিত হওয়াকেই সন্দর্ভ বলা যায়'। 'নিবন্ধ' শব্দটিও বন্ধনযুক্ত রচনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত দীর্ঘ প্রবন্ধকে নিবন্ধ নামে অভিহিত করা হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'প্রবন্ধ' ও 'প্রস্তাব' দুটি শব্দই ব্যবহার করেন। কবি রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' গ্রন্থে প্রবন্ধ শব্দটি বর্তমান অর্থে প্রথম সচেতন ভাবে ব্যবহার করেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রবন্ধ শব্দটি ধীরে ধীরে তার বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' গ্রন্থে শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখছেন "ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবন্ধ শব্দটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা যোগরূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহার ব্যবহার গদ্যের ক্ষেত্রে সংকুচিত হইল।.....

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রসের পরিণতি অপ্রধান সিদ্ধান্তের পরিণতিই মুখ্যবস্তু। সকল প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই ছোট হোক বড় হোক আমাদের একটি প্রতিপাদ্য থাকে। তথ্য প্রমাণের যথাযথ সমাবেশ, ভাবে ভাষায় চিন্তার প্রাখর্যে, সমন্বয়ে এবং পরিচ্ছন্নতায় সেই প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রতিপাদ্য বস্তু প্রত্নতাত্ত্বিক হইতে পারে, ঐতিহাসিক হইতে পারে, ভৌগোলিক হইতে পারে, ধর্ম, রাষ্ট্র সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি কিছু হইতেই তাহার বাধা নাই। হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও রীতিতে যিনি তাঁহার প্রতিপাদ্যকে যতখানি সুস্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন, তিনিই তত বড় প্রবন্ধ লেখক।"

ইংরেজি সাহিত্যের সূত্রে যেহেতু বাংলা সাহিত্যে বর্তমান অর্থে প্রবন্ধের অনুপ্রবেশ, ফলে প্রবন্ধের প্রকারভেদেও ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণ লক্ষ করা যায়। ইংরেজিতে প্রধানত দুভাগে Essay-কে ভাগ করা হয়। (১) Formal or Objective or Impersonal এবং (২) Informal or Subjective or Personal. বাংলাতেও এই প্রকারভেদকে অনুসরণ করে প্রবন্ধকে দুভাগে ভাগে করা হয়। (১) বিষয়নিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধ (২) ব্যক্তিগত বা মন্ময় প্রবন্ধ। যারা আরেকটু পুঙ্খানুপুঙ্খ হওয়ার চেষ্টা করেছেন, তারাও ইংরেজি সাহিত্যেরই দ্বারস্থ হয়েছেন। ইংরেজিতে হ্যারল্ড জে মরিয়াম Essay-কে আট ভাগে ভাগ করেছেন—(i) Treatise/ Monograph, (ii) Bio-graphical/Scientific/Historical/Expository/Critical, (iii) Editorial, (iv) Book Review, (v) Artical, (vi) Character, (vii) Impressionistic এবং (viii) Personal Playful Sketch। এই বিভাজনের আদলে বাংলাতে কেউ কেউ বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। (ক) বিবৃতিমূলক প্রবন্ধ : ঐতিহাসিক বা সাময়িক ঘটনাপ্রসঙ্গ, (খ) বর্ণনামূলক বা তথ্যমূলক প্রবন্ধ : বিজ্ঞানের নানা বিষয়, নিসর্গ, সমাজ-সংস্কৃতিমূলক রচনা, (গ) বিচারমূলক বা মননাশ্রয়ী প্রবন্ধ : ধর্মীয় মতবাদ প্রসঙ্গ, দর্শন তত্ত্বমূলক রচনা, (ঘ) সমালোচনা বা ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ : সাহিত্য প্রসঙ্গ, বিবিধ শিক্ষামূলক রচনা। আর ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে দুইভাগে ভাগ করেছেন, (ক) মনঃপ্রধান ও (খ) অন্তরানুভূতিপ্রধান।

❑ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা :

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে যেমন বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের চর্চা শুরু হয়, তেমনি বাংলা প্রবন্ধ রচনার আংশিক আভাসও এই কলেজের এক পণ্ডিতের রচিত গদ্য সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'তেই প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রাক্‌রূপ লক্ষ করা যায়। তবে বাংলা সহিত্যে প্রবন্ধের যথার্থ সূচনা রামমোহন রায়ের রচনাতেই। রামমোহন রায়ের প্রবন্ধগুলি ধর্মতত্ত্বমূলক আলোচনা এবং সামাজিক আচার বিষয়ক রচনা এই দু-ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁর ধর্মতত্ত্বমূলক আলোচনার মধ্যে পড়বে 'বেদান্তসার', 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রভৃতি, আর সামাজিক আচার বিষয়ক রচনার মধ্যে পড়বে 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ' ইত্যাদি। তাঁর প্রবন্ধে যুক্তি, তথ্য থাকলেও যথার্থ সাহিত্যগুণ ছিল না। রামমোহন পরবর্তী কালে বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম করতে হয়। অক্ষয়কুমার বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর প্রবন্ধের অন্যতম বিশিষ্টতা হল ভাষাগত ওজস্বিতা, প্রাঞ্জলতা, ভাবপ্রকাশগত সংযম এবং বিষয় উপযোগী ভাষা প্রয়োগ। প্রাবন্ধিক রূপে বিদ্যাসাগরের মৌলিক কৃতিত্ব হল, তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ ও মৌলিক প্রবন্ধ রচনার ভাষাগত পার্থক্য লুপ্ত করেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে যুক্তির সঙ্গে হৃদয়াবেগের মিশ্রণ ঘটেছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা প্রবন্ধকে স্বতন্ত্র সাহিত্যিক সংরূপের মর্যাদা দান করেন। তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, সহজ ও যৌক্তিক ভাষাই যে প্রবন্ধ রচনার প্রাণ একথা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দেখান। তিনি নানা বিষয় অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা করেছেন—বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব,

ইতিহাস, সমস্ত বিষয়কেই তিনি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও পরবর্তী প্রাবন্ধিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম করা উচিত। তিনি বস্তুগত ও ব্যক্তিগত দু-রকম প্রবন্ধই রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিকে—সাহিত্য সমালোচনা, রাজনীতি-সমাজনীতি-শিক্ষা, ধর্ম-দর্শন-আধ্যাত্মিকতা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনি ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে শ্রী অতুল গুপ্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করা উচিত—'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ। সাহিত্যের সমালোচনায়, কি রাষ্ট্র ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায়, বাংলা কবিতার ছন্দবিচারে, কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্দতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সর্বত্র পড়েছে মহাকবির মনের ছাপ। সত্র মহাকবির বাগ্‌বৈভব।' এছাড়া রবীন্দ্র সমসাময়িক প্রাবন্ধিকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

প্রস্তাবনা—বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সূচনা ও বিকাশ : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

পুরনো বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ বাক্য বিন্যস্ত যে কোনো রচনা বোঝাতে ব্যবহৃত হত। 'পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস' ধরনের পঙ্‌ক্তি তার প্রমাণ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইংরেজি 'এসে' (Essay)-র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে গৃহীত হয়েছে 'প্রবন্ধ' নামটি। গদ্য রচনার এই বিশেষ ধরনটির প্রথম রূপ দিয়েছিলেন ফরাসি লেখক মিশেল মঁতেইন (১৫৩৩-১৫৯২)। তিনি দিয়েছিলেন 'essai' নাম এবং 'প্রয়াস' অর্থে তা ব্যবহার করেছিলেন। ১৫৯৭-এ এই রচনাধারার দেখা মেলে ইংল্যান্ড-এর লেখক ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon : ১৫৬১-১৬২৬)-এর 'Essays' গ্রন্থে। পরে ড্যানিয়েল ডিফো (Daniel Defoe : ১৬৬০-১৭৩১), জোসেফ অ্যাডিসন (Joseph Addison : ১৬৭২-১৭১৯), চার্লস ল্যাম (Charles Lamb : ১৭৭৫-১৮৩৪), উইলিয়ম হ্যাজলিট (William Hazlitt : ১৭৭৮-১৮৩০) প্রমুখ বহু ইংরেজ গদ্যশিল্পী প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বাংলায় প্রবন্ধ এসেছে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে। উনিশ শতকে সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে গদ্য ব্যবহার সূত্রে বাংলায় এসেছে এই সাহিত্য ধারা।

বাংলায় প্রবন্ধ বলতে বোঝায় চিন্তনপুষ্ট, যুক্তি ও তথ্যে বিন্যস্ত গদ্য নিবন্ধ। প্রবন্ধে বিষয়ের গুরুত্ব এবং বক্তব্যের উপস্থাপনভঙ্গি—দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

গোপাল হালদার যখন প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন তখন বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য কৈশোর অতিক্রম করে পৌঁছেছে বলিষ্ঠ যৌবনে। তাঁর পূর্বকালীন বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত করা যায়—সূচনা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তথা 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২-১৮৭৬) পর্ব; রবীন্দ্রনাথ থেকে 'সবুজপত্র' (১৯২৪-১৯২৮) পর্ব। প্রবন্ধ-বিষয় সাধারণত সমাজ-ভাবনা, ইতিহাস চেতনা, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য-ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান আর ব্যক্তিমনের নিমগ্ন ভাবনার রূপায়ণ—এদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২-১৮৭৬) থেকে বিশ শতক পর্যন্ত প্রধানত সাময়িক পত্র ছিল প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রেরণাদাতা এবং পালনকর্তা।

মূলত ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলা গদ্য হয়ে ওঠে সাহিত্য-মাধ্যম। এই শৈশব গদ্যে মূলত আখ্যানই রচিত হয়েছিল। ক্বচিৎ লেখা হয়েছিল দু-একটি জীবনী; যেমন রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত' (১৮০১) এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' (১৮০৫)। এই গ্রন্থদ্বয়ে প্রবন্ধের বীজ উপ্ত হয়েছে বলা যায়।

বাংলা প্রবন্ধের সূচনা করেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। সমাজ-সংস্কার এবং নব ধর্ম ব্যাখ্যার সচেতন

উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যে সব পুস্তিকা লিখেছিলেন তাদের ভাষা আড়ষ্ট। কিন্তু যুক্তিপ্রাধান্য এবং বিশ্লেষণ প্রবণতার জন্য এসব পুস্তিকা অনেকাংশে প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে। পুস্তিকাগুলি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার এই দুটি ভাগে বিন্যস্ত। ধর্ম বিষয়ক পুস্তিকা—'বেদান্ত' (১৮১৫), 'বেদান্তসার' (১৮১৫) 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' (১৮২০), 'চারি প্রশ্নের উত্তর' (১৮২২), 'গুরুপাদুকা' (১৮২৩), 'পথ্যপ্রদান' (১৮২৩), 'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ' (১৮২৩), 'প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩), 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' (১৮২৬), 'ব্রহ্মোপাসনা' (১৮২৮) ও 'অনুষ্ঠান' (১৮২৯)—এই চোদ্দোটি। সমাজ-সংস্কারমূলক চারটি পুস্তিকার নাম যথাক্রমে—'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯), 'কায়স্থের সহিত মদ্যপানবিষয়ক বিচার' (১৮২৬), 'সহমরণ বিষয়' (১৮২৯)।

রামমোহনের পরে আসেন প্রাবন্ধিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) নাম। রামমোহনের তুলনায় তাঁর প্রবন্ধ-ভাষা সরল, সরস। যদিও তিনিও সমাজ-সংস্কারের জন্যই প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। যুক্তি-সহায়তায় বক্তব্য উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ-প্রবণতা বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর সংস্কারভিত্তিক প্রবন্ধ গ্রন্থ 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম ও ২য় পুস্তক : ১৮৫৫), 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম ১৮৭০, ২য় ১৮৭২) সাহিত্য বিষয়ক তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩)। বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে পাঠের জন্য রচিত প্রবন্ধটি বিদ্যাসাগরের সাহিত্যবোধ ও ব্যাখ্যা-শক্তির প্রমাণ। স্নেহভাজন বালিকা বন্ধুকন্যার মৃত্যুতে রচিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধ 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৬৪) বিদ্যাসাগরের মন্ময় প্রবন্ধ রচনা-দক্ষতার প্রমাণ। স্বলিখিত অসমাপ্ত 'বিদ্যাসাগরচরিত' (১৮৯১) তাঁর চরিত্র প্রবন্ধ রচনা-ক্ষমতার প্রমাণ দেয়। বিদ্যাসাগরের সমকালের লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪) প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২-৭৩) রচনার জন্য স্মরণীয়। গ্রন্থটিতে তৎকালে প্রাপ্ত সকল তথ্যের সহায়তায় বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে লেখকের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য-ইতিহাস রচনার ধারার সূচনা হয় বিদ্যাসাগর ও রামগতি ন্যায়রত্নের প্রয়াসের মাধ্যমে। বিংশ শতকে প্রবন্ধের এই বিশেষ ধারাটি লাভ করে পূর্ণতা।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮২) বেশির ভাগ প্রবন্ধ লিখেছিলেন ইংরেজিতে। বাংলায় লেখা তাঁর অনেক প্রবন্ধই গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা তিন—'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮) 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা' (১৮৫৯) ও 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১)। 'কৃষিপাঠ'-এর অধিকাংশ প্রবন্ধই হর্টিকালচারাল সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ। অতএব এক্ষেত্রেও পত্রিকা প্রবন্ধের পোষকতা করেছে বলা যায়। যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা বক্তব্য উপস্থাপনই প্যারীচাঁদের প্রবন্ধের বিশেষত্ব।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৯৭-১৯০৫) উদ্যোগে প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এ পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) বিজ্ঞানবিষয়ক ও বিজ্ঞানমনস্ক বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য রচনার অগ্রপথিক। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-য় মুদ্রিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞাননিষ্ঠ প্রবন্ধ সংকলন 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ভাগ ১৮৫১, ২য় ভাগ ১৮৫৩) জর্জ কুম্ভ-এর 'কনস্টিটিউশন অব ম্যান' ('Constitution of Man') অবলম্বনে লিখিত হলেও মৌলিক চিন্তা গ্রন্থটির বিশেষত্ব। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকার ষোড়শ ও সপ্তদশ সংখ্যায় মুদ্রিত হোরেস হেম্যান উইলসন (Horace Hayman Wilson : ১৭৮৬-১৮৬০)-এর 'স্কেচ অব দ্য রিলিজিয়াস সেক্টস অব দ্য হিন্দুজ'—নামের দুটি প্রবন্ধ, অক্ষয়কুমার দত্তের 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৬) এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১ম ভাগ ১৮৭০, ২য় ভাগ ১৮৮৩) বই দুটির অবলম্বন। কিন্তু গবেষণা-ধর্মী তথ্য-বিন্যাস এবং তত্ত্ব ব্যাখ্যার দ্বারা অক্ষয়কুমার

দত্ত গ্রন্থদুটিকে করে তুলেছেন মৌলিক সৃষ্টি। বিশেষত দুখণ্ড 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এ অক্ষয়কুমার স্বীয় অনুসন্ধানলব্ধ বহু নতুন তথ্য সংযোজন করেছেন। মৃত্যুর পরে মুদ্রিত 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার' (১৯০১) নামের ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থটিতে অক্ষয়কুমারের দেশপ্রেম ও জ্ঞানসন্ধিৎসু মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রচনারীতির সহজ সাবলীলতা এবং সংহতি অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। বহু পরিভাষাও তিনি রচনা করেছিলেন। গবেষণাধর্মী বাংলা প্রবন্ধের পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত।

'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র স্থপয়িতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬১) এরূপ প্রবন্ধের একটি সংকলন। বেশির ভাগ প্রবন্ধ ব্রাহ্মসমাজে দেওয়া তাঁর বক্তৃতার লিখিত রূপ। তাঁর 'স্বরচিত জীবনচরিত' (১৮৯৮) মন্ময় প্রবন্ধের উত্তম নিদর্শন। গভীর অনুভূতির হৃদয়স্পর্শী সরল ভাষারূপ দান এ গ্রন্থের বিশেষত্ব।

হিন্দু কলেজের ছাত্র ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম ব্যক্তিত্ব ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) বাঙালির শিক্ষা, সমাজ ও পরিবারের উন্নতি বিধানের সচেতন উদ্দেশ্য নিয়েই লিখেছিলেন বেশ কিছু প্রবন্ধ। তাঁর সে সব প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে 'শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬), 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২) এবং 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২)-গ্রন্থ তিনটিতে। তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি প্রবন্ধ-সংকলন ত্রয়ীতে ভাষারূপ লাভ করেছে। সরল ভাষায় যুক্তিবিন্যাস এবং বক্তব্য বিশ্লেষণ তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ভূদেব ছিলেন 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)-র প্রবন্ধ রচনার উৎস ছিল ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার ও স্বদেশপ্রেম। তাঁর প্রায় সব প্রবন্ধই সভা-সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতার লিখিত রূপ। যুক্তি প্রবণতা তথ্য ও তত্ত্বের সুষম বিন্যাস এবং বিশ্লেষণ শক্তি রাজনারায়ণের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। 'ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা' (১ম ১৮৬৬, ২য় ১৮৬৭) 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪), 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের বৃত্তান্ত' (১৮৭৪), 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৮) এবং 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১৮৮৬)—রাজনারায়ণের বিশিষ্ট কয়েকটি প্রবন্ধ-সংকলন।

'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' এবং 'নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) 'ধর্ম্মতত্ত্ব', 'সুলভ সমাচার' (১৮৭০) 'নব বিধান'—নামের তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ব্রাহ্ম নেতা হিসেবে খ্যাত কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন। সরল বলিষ্ঠ ভাষায় রচিত সেই সব প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে 'ব্রাহ্মোৎসব' (১৮৬৮), 'আচার্য্যের উপদেশ' (১৭৯২ শকাব্দ), 'সেবকের নিবেদন' (১৭৯২ শকাব্দ) প্রভৃতি গ্রন্থে। 'জীবনবেদ' (১৮৮৪) তাঁর লেখা আত্মস্মৃতি-মূলক প্রবন্ধের নিদর্শন। বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ধর্ম-নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) গল্প, কবিতা, উপন্যাস ভিন্ন লিখেছিলেন বেশ কিছু ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ। 'বক্তৃতা স্তবক' (১৮৮৮), 'ধর্ম্মজীবন' (১৯০১), 'মাঘোৎসবের উপদেশ' (১৯০১) 'প্রবন্ধাবলী'—প্রভৃতি গ্রন্থে এসব প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। তবে জীবনীভিত্তিক সমাজ-ইতিহাস রচনা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৮৯৭) এবং 'আত্মচরিত' (১৯১৮) এ শ্রেণির প্রবন্ধ-গ্রন্থের নিদর্শন। তাঁর প্রবন্ধ যুক্তি, তথ্য ও সমৃদ্ধ এবং পাঠরম্য। ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য ছাড়াই কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। প্রবন্ধগুলির বিষয় প্রাচীন কবিওয়ালা ও কবিদের জীবনী প্রবন্ধ। এদের বলা যায় প্রথম ক্ষেত্র-সমীক্ষালব্ধ তথ্যনির্ভর বাংলা প্রবন্ধ। তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত'।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় বাংলা প্রবন্ধ ক্রমশ উন্নত হয়ে উঠছিল। তারপরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) লেখনী বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে পূর্ণ যৌবনের লাবণ্যময় বলিষ্ঠতায় অন্বিত করেছিল। বাঙালির মানসিক পুষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি প্রকাশ করেন মাসিক পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২-১৮৭৬)। পত্রিকার প্রয়োজনে তিনি

স্বয়ং বিবিধ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন এবং সমকালের বহু তরুণকে বাংলা প্রবন্ধ রচনায় প্রাণিত করেন। যুক্তি-বিন্যাসের ক্রমানুসারে অনুচ্ছেদ বিভাগের রীতি প্রথম দেখা যায় তাঁর প্রবন্ধে। বাংলায় পুস্তক সমালোচনা এবং শিল্প, সংগীত, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা তিনিই দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তন্ময় এবং মন্ময়—উভয় ধারার প্রবন্ধের রচয়িতা। দু-একটি ব্যঙ্গাতির্যক প্রবন্ধও তাঁর আছে। সহজবোধ্য স্পষ্ট ভাষা আর বিষয়মুখী যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ—তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। বিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ভাষা—এই সব বিষয়ে তিনি রচনা করেছিলেন প্রবন্ধ। তাঁর তন্ময় প্রবন্ধের মধ্যে আছে বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলন—'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫), সাহিত্যকেন্দ্রিক প্রবন্ধগ্রন্থ—'বিবিধ সমালোচন' (১৮৭৬), 'প্রবন্ধপুস্তক' (১৮৭৯), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (এটি 'বিবিধ সমালোচন' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক'-এর প্রবন্ধ সমূহের সংকলন ১ম ১৮৮৭, ২য় ১৮৯২), সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধপুস্তক—'সাম্য' (১৮৭৯), 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' (১৮৮৫), ধর্ম প্রবন্ধ-সংকলন 'কৃষ্ণচরিত্র' (১ম ১৮৮৬, সম্পূর্ণ গ্রন্থ ১৮৯২), 'ধর্ম্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম' (১৯৩৮ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ময় প্রবন্ধ-সংকলন 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫, পরিমার্জিত সংস্করণ 'কমলাকান্ত' ১৮৮৫), ব্যঙ্গ প্রবন্ধপুস্তক 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) ; বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ-সংকলন।

'বিজ্ঞান রহস্য'-এ আছে জীববিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ। তিনি চাকরিসূত্রে মফস্‌ল বাংলা ও কৃষিশ্রমিকদের দুরবস্থার কথা জেনেছিলেন এবং সমাজগঠনের যেসব ত্রুটি এর কারণ তা দূর করার কথা ভেবেছিলেন। 'সাম্য' তাঁর সে চিন্তার ফল। 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' সংকলনে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালিদের সমস্যা ও প্রবণতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'বিবিধ প্রবন্ধ' (দুটি খণ্ডে 'বিবিধ সমালোচনা' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক'-এর সম্মিলিত রূপ। প্রথম গ্রন্থ থেকে 'কৃষ্ণচরিত্র' বাদ দেওয়া হয় যা পরে পৃথক গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়। 'প্রবন্ধ পুস্তক'-এর 'বুড়া বয়সের কথা' 'কমলাকান্ত'-এ স্থান পায়) সংকলনের 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধত্রয়—বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও ভাষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমের দৃষ্টান্ত।

'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগে সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে বঙ্কিমের যেসব প্রবন্ধ আছে সেগুলি 'বঙ্গদর্শন'-এ পুস্তক সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত। এদের মধ্যে সাহিত্যতত্ত্ব মূলক প্রবন্ধ আছে তিনটি—'গীতিকাব্য', 'প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত' এবং 'সঙ্গীত'। সাহিত্যসমালোচনার পর্যায়ে পড়ে 'উত্তরচরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' এবং 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমনা'। শেষের প্রবন্ধ দুটিকে তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনার প্রথম বাংলা নিদর্শন বলা যায়।

'কৃষ্ণচরিত'-এ বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ও সমর-পরিচালক হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এর প্রবন্ধ সমূহে হিন্দুধর্মের নানা তত্ত্ব বিশেষত অনুশীলন তত্ত্ব সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ টমাস ডি কুইন্সি (Thomas De Quency : ১৭৮৫-১৮৫৯)-র 'দ্য কনফেসনস্ অফ অ্যান ইংলিশ অপিয়ম ইটার' ('The Confessions of an English Opium-Eafer')-এর প্রকরণের আংশিক অনুসরণ থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তনশক্তি ও উপস্থাপনকৌশলে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে স্বাধীন সৃষ্টি। এইভাবে ১৮৭২ থেকে ১৮৯২ মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে বাংলা প্রবন্ধ বিষয় বৈচিত্র্য, প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতায়, যুক্তিনির্ভরতায় লাভ করেছিল পূর্ণতা।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং 'বঙ্গদর্শন'-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি বৃত্ত। এই বৃত্তের মধ্যে ছিলেন রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ প্রাবন্ধিক। ঈষৎ পরবর্তী প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে রচনা বৈশিষ্ট্যের বিচারে বঙ্কিম-অনুসারী লেখক বলা যায়।

বাংলা ভাষায় প্রথম পুরাতাত্ত্বিকবিষয়ক প্রবন্ধ-রচয়িতা রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭) 'বঙ্গদর্শন'-এ নিয়মিত লিখতেন। তাঁর এরূপ প্রবন্ধের সংকলন 'ঐতিহাসিক রহস্য' (১৮৭৪-১৮৭৬) ও 'ভারত রহস্য' (১৮৮৫)।

সাপ্তাহিক 'সাধারণী' ও মাসিক 'নব জীবন'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বঙ্কিম-সুহৃদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) ছিলেন বঙ্কিমানুসারী প্রাবন্ধিক। নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করলেও রূপকধর্মী লঘু নিবন্ধ রচনাতেই তিনি ছিলেন নিপুণ। তাঁর এজাতীয় প্রবন্ধের সংকলন 'রূপক ও রহস্য'। ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে তাঁর লেখা প্রবন্ধের সংকলন যথাক্রমে 'সনাতনী' ও 'সমাজ-সমালোচন' (১৮৭৪)।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় বাংলা সাহিত্য চর্চায় মন দিয়েছিলেন। ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুবাদ (১৮৮৫-১৮৮৭) ভিন্ন বাংলা ও ইংরেজিতে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। প্রাচীন ভারত আর বর্তমান ভারতের সমাজজীবন এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর লেখা প্রবন্ধ 'নব জীবন', 'নব্য ভারত' 'ভারতী', 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা' আর 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'-র পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। যুক্তিপ্রধান মিতভাষণ তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের প্রকাশস্থান, প্রকাশকাল এবং নাম দেওয়া হল—'হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস'; 'নব্যভারত' (ভাদ্র, ১৩৯৮ ব.) 'কবি ভবভূতি'; 'সাধনা' (মাঘ, ১২৯৯ ব.), 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'; 'নব্য ভারত' (বৈশাখ, ১৩১০ ব.) 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র'; 'সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা' (৩য় সংখ্যা ১৩০১ ব.), 'ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি'; 'ভারতী' (শ্রাবণ, ১৩০৮ ব.) প্রভৃতি। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় স্বদেশপ্রীতি ছিল তাঁর প্রবন্ধ-রচনার উৎস।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬) গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনায় দক্ষ ছিলেন। যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে তিনিই প্রথম বিদ্যাপতির যথার্থ পরিচয় নির্ণয় করেন। 'নানা প্রবন্ধ' (১৮৮৫) তাঁর একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ-সংকলন। রজনীকান্ত গুপ্তও (১৮৪৯-১৯০০) গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর এরূপ প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাঁচখণ্ডে রচিত 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' (১ম ১৮৭৯, ২য় ১৮৮৬, ৩য় ১৮৯০, ৪র্থ ১৮৯৭, ৫ম ১৯০০) তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে আছে 'জয়দেব চরিত' (১৮৭৩), 'পাণনি' (১৮৭৫), 'প্রবন্ধমালা' (১৮৭৭), 'ভারতকাহিনী' (১৮৮৩) প্রভৃতি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় নিপুণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে কয়েকটি সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ, কিছু লঘু নিবন্ধ আর ভ্রমণ-বৃত্তান্তও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর বেশির ভাগ প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শন', 'নারায়ণ' পত্রিকায় নিবন্ধ রয়ে গেছে। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'ভাণ্ডার' প্রভৃতি পত্রিকায় বাংলার ভাষা সাহিত্য, ধর্ম সম্পর্কে হরপ্রসাদের অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য সম্পন্ধে লেখা তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে আছে 'কালিদাসের মেয়ে দেখান', 'অগ্নিমিত্রের ভাঁড়', 'শকুন্তলায় হিঁদুয়ানী'। 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা' প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেছেন বেদ আসলে লোককবিতার সংকলন। বঙ্গ-বিদ্যা চর্চার পথিকৃৎ হরপ্রসাদ বুঝেছিলেন বাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দেশের কামার, কুমোর, তেলি, মালি প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির গুরুত্ব। তিনি যুক্তি এবং তথ্যসহ প্রমাণ করেছেন বাঙালি মিশ্রজাতি, তার সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতি। দেশজ শব্দবহুল সরল সরস ভাষা আর নিরাসক্তি হরপ্রসাদের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ-সংকলন 'ভারতমহিলা' (১২৮৭ ব.)। 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের ৫৪৩ সংখ্যক গ্রন্থ), 'বৌদ্ধ ধর্ম' (১৯৪৮)—দুটিই মরণোত্তর প্রকাশনা। হরপ্রসাদ বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। সেগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধ গান ও দোহা' (১৯১৬)। এ গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাগীতি। যুক্তি তথ্য সমন্বিত জ্ঞানাত্মক প্রবন্ধ রচনায় হরপ্রসাদ বিশেষ কৃতী ছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) রবীন্দ্র-সমকালীন প্রাবন্ধিক হলেও তাঁর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবই বেশি। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির জন্য আকর্ষক ভাষায় দুরূহ বিজ্ঞান-তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধ রচনা তাঁর বিশেষত্ব। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নব জীবন' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। 'জন্মভূমি', 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'মানসী' ও 'মর্মবাণী', 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়), 'প্রদীপ', 'সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ'—এইসব পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তাঁর মোট প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা বারো। এদের মধ্যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-প্রবন্ধের সংকলন 'প্রকৃতি' (১৮৯৬), 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০), 'জগৎকথা' (১৯২৬)। 'প্রকৃতি'-র চোদ্দোটি প্রবন্ধের অবলম্বন চার্লস রবার্ট ডারউইন (Charles Robert Darwin : ১৭৩১-১৮০২), টমাস হেনরি হাক্স লি (Thomas Henry Huxley : ১৮২৫-১৮৯৫) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের তত্ত্ব। 'বিচিত্র কথা'-য় আছে বাহ্য জগৎ যে বিজ্ঞানের অবলম্বন—এই সত্যের আলোচনা। 'জগৎ কথা'-য় আছে পঁচাত্তরটি পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ। এছাড়া তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ সংকলনেও আছে কয়েকটি বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ। 'বঙ্গালক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬) ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে রচিত। 'যজ্ঞকথা'য় (১৯২০)-য় বৈদিক যজ্ঞের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ ও বিশ্লেষণ আছে। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম যথাক্রমে 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৫), 'মায়াপুরী' (১৯০০), 'কুর্ম্ম-কথা' (১৯১৩), 'চরিতকথা' (১৯১৩), 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪), 'শব্দকথা' (১৯১৭), 'নানাকথা' (১৯২৪), 'মায়াপুরী' পরে 'জিজ্ঞাসা'র অন্তর্ভুক্ত হয়। দুরূহ তত্ত্বের যুক্তিমূলক সহজ ব্যাখ্যা রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। কোনো কোনো প্রবন্ধে তিনি বিজ্ঞান-তথ্যের সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বের সুষম অন্বয় ঘটিয়েছেন।

বঙ্কিম-বৃত্তের বহির্ভূত অথচ রবীন্দ্র-বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত নন—এরূপ প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) প্রধানত দর্শনভিত্তিক প্রবন্ধই লিখেছেন। তাঁর 'তত্ত্ববিদ্যা' (চার খণ্ড; ১৮৬৬-১৮৬৯) এরূপ প্রবন্ধ সংকলনের নিদর্শন। তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ 'গীতাপাঠের ভূমিকা' (১৯১৫)।

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) প্রয়াসে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য সাহিত্যগুণে মণ্ডিত হয়, বিস্তৃত হয় তার পরিসর। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেও গড়ে উঠেছিল একটি সাহিত্যবলয়। 'সাধনা' (১৮৯১), 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) পত্রিকা দুটি সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। 'হিতবাদী', 'সাপ্তাহিক বসুমতী', 'প্রদীপ', 'নারায়ণ', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি সমকালের প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে ১৯১৪-র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—এই সময় পর্বে বাঙালি জীবনের পরিবর্তন, আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাঙালি মনের রূপবদল—রবীন্দ্র-প্রবন্ধকে প্রভাবিত করেছিল। 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকার ১২৮৩ বঙ্গাব্দের (১৮৭৬) কার্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দুখ-সঙ্গিনী ও অবসর সরোজিনী' নামের তিনটি গ্রন্থের সমালোচনা-প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে বঙ্কিম-প্রভাব প্রকট। তবে রবীন্দ্রনাথ অচিরে সে প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-প্রবন্ধ সাহিত্যকে বিষয় অনুসারে মোটামুটি—(ক) সাহিত্যবিষয়ক, (খ) সাহিত্যতত্ত্বমূলক, (গ) সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক, (ঘ) ধর্মভিত্তিক, (ঙ) ভ্রমণ নিবন্ধ, (চ) স্মৃতিচারণা ও (ছ) বিচিত্র বিষয়ক—এই কয়ভাগে বিন্যস্ত করা যায়।

(ক) **সাহিত্য-প্রবন্ধ**—'আলোচনা' (১৮৮৫) ও 'সমালোচনা' (১৮৮৬) রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-বিদেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিক সংক্রান্ত প্রবন্ধের সংকলন। এ দুই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি পরে 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯৩৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭) রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধের সংকলন। 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭)-এ আলোচিত হয়েছে বাংলার জনসাহিত্য; প্রবন্ধগুলি প্রায়ই স্বতন্ত্র সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

(খ) **সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধ**—সমকালের সাহিত্য সমালোচনা আর সাহিত্য রচনার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা'। 'সাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬), 'সাহিত্যের স্বরূপ' (১৯৪৩)—তাঁর এরূপ প্রবন্ধের সংকলন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-তত্ত্বের ভিত্তি ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের রসবাদ এবং পাশ্চাত্যের রোমান্টিসিজম্ জাত সাহিত্যতত্ত্ব। কিন্তু সাহিত্যের রূপ ও ভাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি নিজস্ব বোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন, ফলে সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্ব নামে নতুন এক সাহিত্য-তত্ত্ব।

(গ) **সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিমূলক প্রবন্ধ**—রবীন্দ্রনাথ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে স্বদেশ ও স্ব-সমাজের ত্রুটি বিশ্লেষণ করেছেন কিছু প্রবন্ধে। তাঁর মতে আত্মশক্তির উদ্ভাসেই দেশ ও জাতির যথার্থ স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। তার সঙ্গে মিলেছিল তাঁর মানবহিতৈষণা। ফলে বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে তিনি উদাসীন থাকতে পারেননি। 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'রাজাপ্রজা' (১৯০৮), 'সমাজ' (১৯০৮), 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৯১৭), 'কালান্তর' (১৯৩৭) এবং 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১)—গ্রন্থ পঞ্চকে রবীন্দ্রনাথের এই জাগ্রত রাষ্ট্র ও সমাজ-ভাবনার নিদর্শন সংক্রান্ত প্রবন্ধ সমূহ মুদ্রিত হয়েছে।

(ঘ) **ধর্ম-প্রবন্ধ**—ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা ছিল স্বচ্ছ এবং গোষ্ঠীমুক্ত। উপনিষদ-স্বীকৃত ব্রহ্মবাদের প্রাধান্য থাকলেও তাঁর ধর্মচিন্তায় স্ব-উপলব্ধিজাত বিশ্বাসের প্রকাশ লক্ষিত হয়। সে বিশ্বাস মতে মনুষ্যত্বের বিকাশ আর সর্ব মানবের কল্যাণসাধনই যথার্থ ধর্ম। 'ব্রহ্মোপনিষদ' (১৮৯৯), 'ব্রহ্মমন্ত্র' (১৯০০), 'উপনিষদ ব্রহ্ম' (১৯০১), 'ধর্ম' (১৯০৯), 'শান্তিনিকেতন (১ম-৮ম খণ্ড ১৯০৯, ৯ম-১৩শ খণ্ড ১৯১০-১৯১১, ১৪শ-১৭শ খণ্ড ১৯১৫-১৯১৬), 'ধর্মের অধিকার' (১৯১২), 'সঞ্চয়' (১৯১৬), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩)—তাঁর ধর্মচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন।

(ঙ) **ভ্রমণ নিবন্ধ**—রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ ভ্রমণকথাই চিঠি ও দিনলিপির আকারে রচিত। পত্রাকারে লিখিত ভ্রমণকথার মধ্যে আছে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' (১ম ১৮৯১, ২য় ১৮৯৩), 'জাপানযাত্রী' (১৯১৯), 'যাত্রী' (১৯২৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯৩৮), 'পথের সঞ্চয়' (১৯৩১)। এইসব ভ্রমণকথামূলক পত্র-নিবন্ধে বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনার সঙ্গে আপন ভাবনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে প্রবন্ধগুলি হয়ে উঠেছে মূল্যবান ও আকর্ষক।

(চ) **আত্মবিশ্লেষণ ও স্মৃতিনিবন্ধ**—'জীবনস্মৃতি' (১৯১২), 'ছেলেবেলা' (১৯৪৩) এবং 'আত্মপরিচয়' (১৯৪৩) এই ধারার প্রবন্ধ গ্রন্থ। প্রথম দুই গ্রন্থে ঘটনামূলক স্মৃতিমন্থন সূত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কবিসত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। 'আত্মপরিচয়' সম্পূর্ণত আত্মভাববিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ।

(ছ) **বিচিত্র বিষয়ক**—ইতিহাস, শিক্ষা, ভাষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬) এবং 'স্বদেশ' (১৯০৮) তাঁর ইতিহাস-প্রবন্ধের সংকলন।

'শিক্ষা' (১৯০৮), 'শিক্ষার মিলন' (১৯২১), 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (১৯৩৩), 'শিক্ষার বিকিরণ' (১৯৩৩), 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' (১৯৩৬), 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (১৯৪১)—তাঁর শিক্ষাচিন্তা এবং তার বাস্তব রূপদানের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ। বাংলা ভাষা বিষয়ক রবীন্দ্র-প্রবন্ধের সংকলন 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯), 'ছন্দ' (১৯৩৬) এবং 'বাংলা ভাষাপরিচয়' (১৯৩৮)। বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি আগ্রহী ছিলেন। কিছু বিজ্ঞান পরিভাষাও তিনি নির্মাণ করেছিলেন। সাহিত্যলাবণ্য-সমন্বিত 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) তাঁর বিজ্ঞান-প্রবন্ধের নিদর্শন। 'চারিত্রপূজা' (১৯০৭), 'প্রসাদ' (১৯৩৯) এবং 'মহাত্মা গান্ধী' (১৯৪৮)—তাঁর রচিত জীবনী প্রবন্ধের নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের আত্মভাবনামূলক মন্ময় প্রবন্ধের সংকলন 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩), 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭) এবং 'পরিচয়' (১৯১৬)। এই সংকলনগুলির মধ্যে গঠনকৌশল এবং চিন্তনের গভীর সুষম প্রকাশে অনন্য 'পঞ্চভূত' গ্রন্থটি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধভাষা উপমাসমৃদ্ধ কাব্যলাবণ্যমণ্ডিত এবং স্বচ্ছ। সময় এবং বিষয় অনুসারে তাঁর প্রবন্ধ ভাষাও পরিবর্তিত হয়েছে। অনুভব-গভীরতা, চিন্তনগাঢ়তা এবং ভাষায় তার সুষম প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে করেছে উজ্জ্বল এবং সুন্দর।

রবীন্দ্র-সমকালের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) বিজ্ঞান বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেগুলি সংকলিত হয়েছে তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ-সংকলন 'অব্যক্ত'-এ। এই সংকলনের বিজ্ঞান-প্রবন্ধগুলি জগদীশচন্দ্রের কবিমন, দার্শনিক দৃষ্টি ও বিজ্ঞানীর মন ও দৃষ্টির পরিচায়ক। জটিল বিজ্ঞান-তথ্যের রম্য প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) ছিলেন একই সঙ্গে বিজ্ঞানী এবং প্রাবন্ধিক। তাঁর বাংলায় লেখা বিজ্ঞান-প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র দুটি—'প্রাণীবিজ্ঞান' (১৯০৩) এবং 'নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' (১৯০৬)। সরলতা এবং স্পষ্টতা তাঁর প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য।

জগদানন্দ রায় (১৮৬৮-১৯২৯) সরল সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের প্রায় সব বিভাগ এবং উল্লেখ্য আবিষ্কার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা আঠারো। সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিজ্ঞানের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর বিজ্ঞান-নিবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) ছিলেন শক্তিমান প্রাবন্ধিক। তবে তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধেরই ভাষা ইংরেজি। পাক্ষিক 'উদ্বোধন' পত্রিকায় তাঁর প্রায় সব বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 'উদ্বোধন' ভিন্ন 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকাটিও তাঁর পরিচালনায় মুদ্রিত হত। ভারতের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাই বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২), 'বর্ত্তমান ভারত' (১৯০৫, মরণোত্তর প্রকাশ), 'ভাববার কথা' (১৯০৭, মরণোত্তর প্রকাশ) গ্রন্থত্রয়ের বিশেষত্ব। মরণোত্তর প্রকাশ 'পরিব্রাজক' (১৯০৫) পাঠরম্য ভ্রমণ নিবন্ধ। প্রবন্ধের বিষয় অনুসারে ভাষার ব্যবহার বিবেকানন্দের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। 'বর্ত্তমান ভারত'-এর বলিষ্ঠ সাধুভাষা 'ভাববার কথা'-র বিদ্রূপতীক্ষ্ণ চলিত ভাষা প্রাবন্ধিক বিবেকানন্দের লিখন-কুশলতার পরিচায়ক। তাঁর লেখা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) রবীন্দ্র-সমকালীন হলেও ছিলেন রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত মননশীল প্রাবন্ধিক। স্বসম্পাদিত 'সবুজ পত্র' পত্রিকা তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তার পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র ছিল। চলিত ভাষার মার্জিত, মননদীপ্ত তির্যক ব্যঙ্গমিশ্রিত প্রয়োগ; বিষয়ের নিরাসক্ত যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপন এবং বিতর্কপ্রবণতা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। 'বীরবল' ছদ্মনামে তিনি কয়েকটি শ্লেষাত্মক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। একটি আত্মস্মৃতিসহ তাঁর প্রবন্ধ সংকলনের সংখ্যা তেরো। এগুলির মধ্যে 'তেল-নুন-লকড়ী' (১৯০৬), 'দু-ইয়ারকি' (১৯২১), 'রায়তের কথা'

(১৯২৬), 'ঘরে বাইরে' (১৯৩৬)—তাঁর রাষ্ট্রনীতি ও সমাজসমস্যা বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। 'নানা চর্চা' (১৯৩২), 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' (১৯৪০)-এ তাঁর ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে। 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭) এবং 'বীরবলের টিপ্পনী' (১৯২১) ভাষা, সাহিত্য এবং বিবিধ বিষয়ক ব্যঙ্গাশাণিত প্রবন্ধের সংকলন। 'আত্মকথা' (১৯৪৬) প্রমথ চৌধুরীর স্মৃতিনিবন্ধের নিদর্শন।

বুদ্ধিনির্ভর আঙ্গিক-সচেতন প্রবন্ধের একটি ধারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। এই ধারায় পরবর্তী স্মরণীয় প্রাবন্ধিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং গোপাল হালদারের আবির্ভাব।

প্রখ্যাত গবেষক দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) কবিত্বময় সহজ ভাষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আবেগ ও যুক্তির মিশ্রণ তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৫) এবং 'বৃহৎ বঙ্গ' (১ম ও ২য় খণ্ড ১৯০৫)। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে উল্লেখ্য গ্রন্থ 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' (১৯২২), 'পদাবলী মাধুর্য্য' (১৯৩৭), 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' (১৯৪০)।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯) বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রবীন্দ্রানুসারী হলেও ভাষা ও বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি নিজস্বতার পরিচয় দিতে পেরেছেন তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব আত্মমগ্নতা। তিনিই প্রথম বাংলায় ভারতীয় চিত্রশিল্প বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। বাংলার প্রথা ও আচার সম্বন্ধেও তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ 'বালক', 'ভারতী ও বালক' এবং 'সাধনা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ সংকলন 'চিত্র ও কাব্য' (১৮৯৪)।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন (১৮৬৮-১৯৪২) রবীন্দ্র-সমকালের কৃতী দার্শনিক-প্রবন্ধকার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের নিবিড় পাঠ তাঁর প্রবন্ধকে করেছে সুবোধ্য। শাস্ত্রীয় বিষয়কে যুক্তিসম্মত চিন্তনশক্তি সহায়ে স্বচ্ছতা দান এবং মননদীপ্ত আকর্ষক ভাষা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত চোদ্দোটি প্রবন্ধ-সংকলনের রচয়িতা হীরেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' (১৯০৫)।

বিশিষ্ট চিত্রকার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫০) চিত্র এবং শিল্প এবং শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে সজীব সাবলীল ভাষায় বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর এসব প্রবন্ধের সংকলন যথাক্রমে 'ভারতশিল্প' (১৯০৯), 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' (১৯৪১), 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' (১৯৪৭) এবং 'ভারতশিল্পে মূর্তি' (১৯৪৭)। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক' রূপে প্রদত্ত উনত্রিশটি শিল্পতত্ত্ব সংক্রান্ত বক্তৃতার সংকলন 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'। 'বাংলার ব্রত' নামের ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পুস্তিকায় তিনি মনোজ্ঞ ভাষায় বাংলার মেয়েলি ব্রতের ও আলপনার বিশ্লেষণ করেছেন। 'ঘরোয়া' (১৯৪১) 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৪) এবং 'আপন কথা' (১৯৪৬) তাঁর স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধের নিদর্শন। সহজ অথচ কাব্যময় ভাষায় বিষয় উপস্থাপন অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিশেষত্ব।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৯-১৯৪০) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ছাব্বিশটি ভাষা জানতেন। কোশ-গ্রন্থ প্রণেতা, সাময়িক-পত্র সম্পাদক অমূল্যচরণ দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, সংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এবং সাহিত্য বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। চিন্তনগাঢ় প্রবন্ধের রচয়িতা অমূল্যচরণের প্রবন্ধের বিশেষত্ব প্রামাণ্য তথ্যের যথাযথ সন্নিবেশ এবং নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। সহজবোধ্য স্পষ্ট ভাষা তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব। গবেষণামূলক

প্রবন্ধরচয়িতা ভারততত্ত্ববিদ প্রাবন্ধিক অমূল্যচরণকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উত্তরপুরুষ বলা যায়। তাঁর দুটি প্রবন্ধ সংকলন 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য' (১৯৬২) এবং 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা' (১৯৬৫) মরণোত্তর প্রকাশনা।

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) শিক্ষা, সমাজসমস্যা, ধর্ম—বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচক হিসেবেই তিনি খ্যাত। তাঁর প্রবন্ধের প্রকরণ ও ভাষায় ঈষৎ রবীন্দ্র-প্রভাব আছে। কাব্যময় ভাষা, বক্তব্যের স্পষ্টতা এবং প্রকাশমাধুর্য অজিতকুমারের প্রবন্ধের বিশেষত্ব। তাঁর আটটি প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে আছে জীবনী গ্রন্থ 'খৃষ্ট' (১৯১১), 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯১৬), 'রাজা রামমোহন' (১৯১৭)। 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯১২) এবং 'কাব্যপরিক্রমা' (১৯১২) তাঁর রবীন্দ্র-সমালোচনা প্রবন্ধের সংকলন। 'লোকহিতের আদর্শ' (১৯১৪) সমাজ কেন্দ্রিক প্রবন্ধের সংকলন। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৯১১) শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্পর্কিত প্রবন্ধ-গ্রন্থ এবং 'বাতায়ন' (১৯১৩) সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম বিষয়ক দশটি প্রবন্ধের সংকলন। রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অজিতকুমার গভীর সাহিত্যবোধ ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।